ইউনিট ১
গৃহপালিত পাখি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব

ইউনিট ১ গৃহপালিত পাখি উৎপাদনে রোগব্যাধির গুরুত্ব

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ বুনো পাখিদের পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পাখিতে পরিণত করেছে। এসব গৃহপালিত পাখি বা পোল্ট্রি মানুষকে দিয়েছে উন্নতমানের আমিষ, স্নেপদার্থ, খণিজ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ ডিম ও মাংস। মানুষ পোল্ট্রির বিভিন্ন উপজাত বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করেছে। এদের পালক দিয়ে সাজিয়েছে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ। লিটারমিশ্রিত মল সার হিসেবে ব্যবহার করেছে। মোটকথা, মানুষের খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে পোল্ট্রি বা গৃহপালিত পাখির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের গৃহপালিত পাখির মধ্যে মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল, রাজহাঁস, টার্কি, তিতির ইত্যাদি প্রধান। যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এসব পাখি পালন করে আসছে, তথাপি এদেরকে বৈজ্ঞানিকভাবে আধুনিক ব্যবস্থায় সুশৃংখলভাবে পালনের ইতিহাস কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। বর্তমানে গৃহপালিত পাখি পালন বিশ্বে এক ধরনের শিল্প হিসেবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। পোল্ট্রি শিল্প নামে খ্যাত এ শিল্প মানুষকে এনে দিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে পোল্ট্রি শিল্প ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও বাংলাদেশে এ শিল্প একেবারেই নতুন, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল। তবে, এখনো এদেশে এ শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত পুঁজির অভাব, খাদ্য সমস্যা, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, বিপনন সমস্যা, রোগব্যাধি ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর মধ্যে রোগব্যাধির সমস্যাটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। কাজেই পোল্ট্রি খামার থেকে লাভ পেতে হলে অর্থাৎ পোল্ট্রি থেকে সঠিক উৎপাদন পেতে হলে এদের রোগব্যাধি সম্পর্কে খামারী বা পালনকারীকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতে হবে। পোল্ট্রি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এসব রোগ পোল্ট্রির উৎপাদন ব্যহত করা ছাড়াও এদের মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পোল্ট্রির রোগব্যাধি দূরীকরণে বা দমনে সাধারণত চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ ব্যবস্থাই বেশি কার্যকরী। তাই খামারকে রোগমুক্ত রাখতে প্রয়োজন উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা এবং পোল্ট্রিকে নিয়মিত টিকাদান।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে পোল্ট্রি উৎপাদনে রোগব্যাধির প্রভাব, রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস ও বিস্তার এবং রোগব্যাধি দমনে সাধারণ করণীয় বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১.১ পোল্ট্রি উন্নয়নে রোগব্যাধির প্রভাব

এ পাঠ শেষে আপনি –

- হাঁসমুরগি ও অন্যান্য পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগের নাম বলতে পারবেন।
- পোল্ট্রির ওপর বিভিন্ন রোগের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

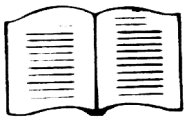

রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। তাই পোল্ট্রিকে রোগমুক্ত রাখতে না পারলে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগব্যাধি

রোগব্যাধি পোল্ট্রির জন্য এক বিরাট হুমকি। পোল্ট্রি খামারে লোকসানের যতগুলো কারণ রয়েছে রোগব্যাধি তার অন্যতম। তাই রোগব্যাধি থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করতে না পারলে খামার থেকে লাভ তো দূরের কথা খামারের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। পোল্ট্রি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এগুলোর মধ্যে যেমন জীবাণুঘটিত বা সংক্রামক রোগ রয়েছে তেমনি রয়েছে পুষ্টিহীনতা, বিপাকীয়, বিষক্রিয়া বা ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসংক্রান্ত রোগ অর্থাৎ অসংক্রামক রোগ। সাধারণত বয়স্ক পোল্ট্রির তুলনায় বচ্চাগুলো রোগব্যাধির প্রতি বেশি সংবেদনশীল। তাই বাচ্চাগুলো সহজেই নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পোল্ট্রির বিভিন্ন সংক্রামক রোগের মধ্যে রাণীক্ষেত, বসন্ত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, পুলোরাম, করাইজা, যক্ষ্মা,

মাইকোপ-াজমোসিস, ব্রুডার নিউমোনিয়া, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি প্রধান। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পরজীবীঘটিত রোগ, যেমন– ককসিডিওসিস, বিভিন্ন ধরনের কৃমির আক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবীঘটিত রোগ। অসংক্রামক রোগের মধ্যে অপুষ্টিজনিত, যেমন– নিউট্রিশনাল রোপ, রিকেট, কালর্ড-টো-প্যারালাইসিস, পলিনিউরাইটিস, চিক ডার্মাটাইটিস, এনসেফালোম্যালাসিয়া ইত্যাদি এবং ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসংক্রান্ত রোগের মধ্যে ক্যানিবালিজম, ডিম আটকে যাওয়া, ডিম্বনালি বের হয়ে যাওয়া, হিট স্ট্রেস, স্পর্শজনিত চর্মপ্রদাহ ইত্যাদি অন্যতম।

পোল্ট্রির ওপর রোগব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব

বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পোল্ট্রিকে আক্রমণ করে।

পোল্ট্রি থেকে সঠিক হারে উৎপাদন পাওয়ার প্রধান অন্তরায় হলো রোগব্যাধি। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি পোল্ট্রিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে। এতে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এদের মৃত্যুও ঘটে থাকে। কাজেই রোগব্যাধির কারণে পোল্ট্রির উৎপাদন মারাত্তকভাবে ব্যহত হয়।

পোল্ট্রি বা হাঁসমুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান।

হাঁসমুরগির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ রোগ পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। এগুলো নানাভাবে পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করতে পারে। কিছু কিছু রোগ সরাসরি আক্রমণ করে। আবার কিছু কিছু রোগ, যেমন– স্পাইরোকিটোসিস ও অ্যাভিয়ান ম্যালেরিয়া কীটপতঙ্গ অর্থাৎ ভেক্টরের (Vector) মাধ্যমে ছড়ায়। মুরগির কয়েকটি রোগ, যেমন– ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, পুলোরাম ইত্যাদি ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চায় ছড়ায়। এ রোগগুলো একদিকে যেমন দমন করা কঠিন, অন্যদিকে তেমনি ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন একেবারেই কমিয়ে দেয়। তাছাড়া এসব রোগে আক্রান্ত মুরগির মৃত্যুহারও অত্যন্ত বেশি।

খামার উন্নয়নে ককসিডিওসিস একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল।

খামার উন্নয়নে প্রোটোজোয়াজনিত ককসিডিওসিস রোগ একটি মারাত্মক সমস্যা। এ রোগের ফলে বাচ্চা মুরগির মৃত্যু হার ১৫–২০% এ দাঁড়ায়। কোনো খামারে একবার এ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটলে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা বেশ জটিল হয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় এবং রোগ থেকে সেরে ওঠা মুরগির উৎপাদন ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়।

মুরগির ডিম উৎপাদনে ভাইরাসঘটিত এগ ড্রপ সিন্ড্রোম নামক রোগটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এ রোগে আক্রান্ত ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদন কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় পৌঁছে।

নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান না করলে পোল্ট্রিতে রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

সঠিক সময়ে ও নিয়মানুযায়ী টিকা প্রদান করা না হলে পোল্ট্রিতে ভাইরাসঘটিত রোগ, যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স, ইনফেকশাস ব্রঙ্কাইটিস, ডাক প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এসব রোগ একবার কোনো এলাকায় বা খামারে মহামারি আকারে দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ভাইরাসঘটিত রোগ হওয়ায় এখন পর্যন্ত এগুলোর কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এসব রোগে আক্রান্ত পোল্ট্রিতে মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা।

এদেশে অ্যাসপারজিলোসিস, ওমফ্যালাইটিস ও করাইজা বা সর্দি রোগ বাচ্চা মুরগির সাধারণ সমস্যা। ডিম ফোটানোর যন্ত্র বা ইনকিউবেটর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিচালনা না করলে বাচ্চায় ওমফ্যালাইটিস রোগ দমন করা যাবে না। কারণ, এ রোগের জীবাণু *Escherichia coli (ইস্কেরিশিয়া কলাই)* এমনিতেই প্রকৃতিতে অবস্থান করে। ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত ত্রুটির কারণে মুরগি সর্দি বা করাইজা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। অত্যধিক ঠান্ডায় এ রোগের জীবাণু মুরগিকে আক্রান্ত করে। এ রোগগুলোর ফলে একদিকে যেমন মুরগির মৃত্যু ঘটে, অন্যদিকে বাড়ন্ত মুরগির বাড়ন ব্যহত হয় ও উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজ সরবরাহ না করলে এসবের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

খাদ্যে পরিমিত মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজপদার্থ সরবরাহ না করলে ভিটামিন ও খণিজের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশে এ সমস্যাটি ব্যাপক। এসব রোগের ফলে মুরগি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায়, উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়।

এদেশে সঠিক নিয়মে খাদ্য সংরক্ষণ করা এক বিরাট সমস্যা। পোল্ট্রির খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে খাদ্যে এক ধরনের ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে। এ ছত্রাক এক ধরনের বিষ উৎপন্ন করে যা খেলে

খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এতে ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে।

পোল্ট্রিতে মাইকোটক্সিকোসিস রোগ দেখা দেয়। ফলে এদের ডিম উৎপাদন একেবারেই কমে যায় এবং মৃত্যু হার অত্যন্ত বেড়ে যায়।

খামারে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব, সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ না করা, মৃত পোল্ট্রি সঠিকভাবে সৎকার না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বিভিন্ন প্রাণী, ধূলিকণা, দুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো ইত্যাদি দায়ী।

পোল্ট্রিতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ

নিম্নলিখিত কারণে এদেশে পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। যেমন–

- কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব– এদেশে কার্যকর কোনো পোল্ট্রি নীতি না থাকায় পরিচিতি ছাড়াই অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে রোগাক্রান্ত ডিম, বাচ্চা, মুরগি ইত্যাদি আমদানি হচ্ছে।
- সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণের অভাব– বেশিরভাগ খামারেই সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে এতে নানা রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। তাছাড়া খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলো পরিমিত মাত্রায় মিশিয়ে সরবরাহ না করলে পাখি রোগাক্রান্ত হয়।
- মৃত হাঁসমুরগি যেখানে সেখানে ফেললে কুকুর, শিয়াল ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী সেগুলো খায় ও পরিবেশে রোগজীবাণু ছড়ায়।
- ইনকিউবেটর ও হ্যাচারির অন্যান্য যন্ত্রপাতি ঠিকমতো জীবাণুমুক্ত না করলে এগুলো থেকে ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় রোগ ছড়াতে পারে।
- ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে রোগ ছড়াতে পারে।
- কীটপতঙ্গের মাধ্যমে রোগ ছড়াচ্ছে।
- বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাও অনেক রোগের জীবাণু ছড়াচ্ছে।
- দুষিত পানি রোগজীবাণু ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম।
- পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়ায়।
- পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমেও রোগ ছড়াতে পারে।
- খামারে মানুষ অবাধে চলাফেরা করলে মানুষের জামা, জুতো ইত্যাদির মাধ্যমে রোগের জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার মতে এ পাঠে আলোচিত কোন্ রোগটি পোল্ট্রি উৎপাদনে সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলে? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।*

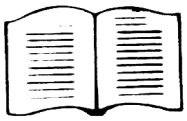

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রি উৎপাদনে প্রধান অন্তরায় বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি। এসব রোগব্যাধি সংক্রামক বা অসংক্রামক ধরনের হতে পারে। তবে, যে ধরনেরই হোক না কেন রোগাক্রান্ত পোল্ট্রি থেকে কখনোই ভালো উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নয়। কিছু কিছু রোগ শুধু উৎপাদনই ব্যহত করে না বরং পোল্ট্রির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু কিছু রোগ বাচ্চা পোল্ট্রিকে এবং কিছু কিছু রোগ বয়স্ক পোল্ট্রিকে আক্রান্ত করে। আবার কোনো কোনো রোগ ডিমের মাধ্যমে ভ্রূণ হয়ে সদ্যফোটা বাচ্চাকে আক্রান্ত করে থাকে। এসব রোগব্যাধির প্রকোপ পোল্ট্রিতে নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন– কার্যকর পোল্ট্রি নীতির অভাব, সঠিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ না করা, মৃত পোল্ট্রি সঠিকভাবে সৎকার না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, বিভিন্ন প্রাণী, ধূলিকণা, দুষিত পানি, মানুষের জামা-জুতো ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. নিউট্রিশনাল রোপ কোন্ ধরনের রোগ?

i) সংক্রামক
ii) অসংক্রামক
iii) অপুষ্টিজনিত
iv) ii ও iii দুটোই

খ. কোন্ রোগটি ডিমের মাধ্যমে বাচ্চায় ছড়ায়?

i) রাণীক্ষেত
ii) এগ ড্রপ সিন্ড্রোম
iii) ফাউল টাইফয়েড
iv) গামবোরো

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. ককসিডিওসিস রোগে বাচ্চা মৃত্যু হার ১৫–২০%।
খ. ভিটামিন ও খণিজের অভাবে পাখি দিনে দিনে রোগা হয়ে যায়।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ছত্রাকের বিষের কারণে পোল্ট্রিতে _____ রোগ হয়।
খ. কার্যকর পোল্ট্রি থথথথথ অভাবে অবাধে বিভিন্ন দেশ থেকে পোল্ট্রি আমদানি হচ্ছে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. মৃত পোল্ট্রি যেখানে সেখানে ফেললে কী হয়?
খ. এমন তিনটি রোগের নাম লিখুন যেগুলোর কারণে পোল্ট্রিতে ১০০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে?

পাঠ ১.২ রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস ও বিস্তার

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অণুজীব ও রোগজীবাণু কী তা বলতে পারবেন।
- গৃহপালিত পাখিতে রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর নাম ও প্রকৃতি লিখতে পারবেন।
- কীভাবে এসব জীবাণু পোল্ট্রিতে বিস্তারলাভ করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

অণুজীব (Microorganisms)

যেসব ক্ষুদ্র জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরকে অণুজীব বলে। যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটশিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি।

যেসব ক্ষুদ্র জীব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না তাদেরকে অণুজীব বলে।

রোগজীবাণু (Pathogen/Pathogenic Microorganisms)

অণুজীবের মধ্যে কোনো কোনোটি রোগ সৃষ্টি করে। আবার কোনো কোনোটি পশু বা পাখিদেহে অবস্থান করলেও কোনো প্রকার রোগ সৃষ্টি করে না। যেসব অণুজীব দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে রোগজীবাণু বলে। এখানে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো এবং এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যেসব অণুজীব দেহে রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে রোগজীবাণু বলে।

রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস

রোগজীবাণুর শ্রেণিবিন্যাস নিম্নে দেখানো হলো–

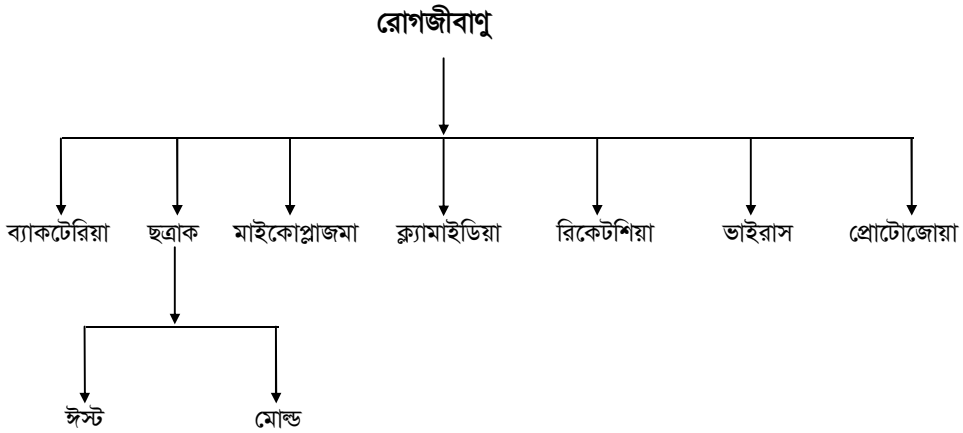

ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)

ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র এককোষিয় অণুবীক্ষণিক জীবাণু। এদের কোষপ্রাচীর থাকলেও কোনো নিউক্লিও পর্দা নেই। রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া টক্সিন (Toxin) বা বিষ তৈরি করে। ফলে আক্রান্ত পাখিতে রোগলক্ষণ দেখা যায়। ব্যাকটেরিয়ার আয়তন ০.৪ হতে ১.৫ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। আমরা খালি চোখে ১০০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু সাধারণত দেখি না। নিম্নলিখিতভাবে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন–

ব্যাকটেরিয়া অতি ক্ষুদ্র এককোষিয় অণুবীক্ষণিক জীবাণু যাদের কোষপ্রাচীর থাকলেও কোনো নিউক্লিও পর্দা নেই।

গ্রাম স্টেইনে প্রতিক্রিয়া, অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবৃদ্ধি, আকার-আকৃতি প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে সাধারণভাবে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

১. গ্রাম স্টেইনের প্রতিক্রিয়ার ওপর– গ্রাম স্টেইনে (Gram's Stain) প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ এ দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– *Streptococcus zooepidemicus (স্ট্রেপটোকক্কাস জুএপিডেমিকাস)* গ্রাম পজেটিভ ও *Escherichia coli* গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া।

২. অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর– অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবৃদ্ধি করতে পারার ওপর এদেরকে যথাক্রমে সবাত বা অ্যারোবিক (Aerobic) এবং অবাত বা অ্যানেরোবিক (Anaerobic) এ দু'শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন– *Streptococcus* গণের ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যারোবিক এবং *Chlostridium botulinum (ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম)* ও অন্যান্য Clostridial ব্যাকটেরিয়াগুলো অ্যানেরোবিক।

৩. আকার-আকৃতির ওপর– আকার-আকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. কক্কাস বা কক্কাই (Coccus or Cocci) ঃ এরা দেখতে প্রায় গোলাকার। এরা একাকি, জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ ডিপ্লোকক্কাই (Diplococci), চেইন আকারে অর্থাৎ স্ট্রেপটোকক্কাই (Streptococci) এবং অনিয়মিত গুচ্ছকারে বা স্টেফাইলোকক্কাই (Staphylococci) হিসেবে থাকতে পারে (চিত্র ১ ক দেখুন)। যেমন– *Streptococcus pyogenes (স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনিস), Staphylococcus aureus (স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস)* ইত্যাদি।

ডিপে-াকক্কাই স্ট্রেপটোকক্কাই স্টেফাইলোকক্কাই

চিত্র ১ ক ঃ বিভিন্ন ধরনের কক্কাই ব্যাকটেরিয়া

খ. ব্যসিলাস বা ব্যাসিলাই (Bacillus or Bacilli) ঃ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ব্যাসিলাস (একবচনে) বা ব্যাসিলাই (বহুবচনে) বলে। যেমন– *Clostridium botulinum, Escherichia coli* ইত্যাদি।

Corynebacterium Spp. *Pasteurella multocida* *Clostridium Spp.*

Bacillus Spp. *Bacillus anthracis*

চিত্র ১ খ ঃ বিভিন্ন ধরনের ব্যাসিলাই ব্যাকটেরিয়া

গ. ভিব্রিওস (Vibrios) ঃ এগুলো দেখতে ক্ষুদ্র কমা ( ) আকৃতির। যেমন– *Campylobacter jejuni (ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি)*।

ঘ. স্পাইরোকিটস (Spirochaetes) ঃ এরা দেখতে স্ক্রুর ন্যায় প্যাঁচানো। যেমন– *Borrelia anserina (বরেলিয়া অ্যানসারিনা)*।

ঙ. লেপ্টোস্পাইরা (Leptospira) ঃ এরা দেখতে অনেকটা হিটারের ঢিলা কয়েলের ন্যায়। যেমন– *Leptospira* Spp. (*লেপ্টোস্পাইরা* প্রজাতি)।

ভিব্রিওস স্পাইরোকিটস লেপ্টোস্পাইরা

চিত্র ১ গ ঃ ভিব্রিওস, স্পাইরোকিটস ও লেপ্টোস্পাইরা

ছত্রাক (Fungus or Fungi)

ছত্রাক এক বা বহুকোষি হতে পারে। এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট, আর বহুকোষিগুলোকে মোল্ড বলে।

এ আদিকোষি জীবাণুটি এককোষি বা বহুকোষি হতে পারে। এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট (Yeast) বলে। আর বহুকোষি ছত্রাকগুলোকে বলে মোল্ড (Mould)। মোল্ডের কোষগুলো সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় ফিলামেন্টের (Filament) সাহায্যে শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি করে। প্রতিটি সূত্র হাইফা (ঐঁঢ়যধ) নামে পরিচিত। একসাথে অনেকগুলো হাইফা মিলে ছত্রাক দেহ বা মাইসেলিয়াম (Mycelium) গঠন করে। প্রতিটি হাইফা আয়তনে ২–১০ মাইক্রোমিটার হতে পারে। ছত্রাকের মধ্যে *Aspergillus fumigatus (অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস)*, *Aspergillus favus (অ্যাসপারজিলাস ফ্যাভাস)* ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ২ ঃ মোল্ড প্রকৃতির ছত্রাক

মাইকোপ্লজমা (Mycoplasma)

মাইকোপ্লাজমা আয়তনে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাঝামাঝি। এদের কোনো কোষপ্রাচীর নেই।

মাইকোপ্লাজমা আয়তনে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মাঝামাঝি। এদের আয়তন ০.১৫–১.০ মাইক্রোমিটার হতে পারে। এ জীবাণুর বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোনো কোষপ্রাচীর নেই। তাই এদের বিরুদ্ধে পেনিসিলিন কার্যকরী নয়। তবে, কোষপ্রাচীর না থাকলেও এরা তিন স্তরের প্লাজমা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। *Mycoplasma gallisepticum* (*মাইকোপ্লাজমা গ্যালিসেপ্টিকাম*), *Mycoplasma synovae* (*মাইকোপ্লাজমা সাইনোভি*) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ মাইকোপ্লজমা জীবাণু।

চিত্র ৩ ঃ মাইকোপ্লাজমার দেহের বিভিন্ন অংশ

ক্ল্যামাইডিয়া (ঈযষধসুফরধ)

ক্ল্যামাইডিয়া গোলাকৃতির। এরা কোষের মধ্যে বিস্তারলাভ করে।

ক্ল্যামাইডিয়া দেখতে গোলাকৃতির। পূর্বে এদেরকে ভাইরাস মনে করা হতো। এ অতিক্ষুদ্র জীবাণুটি কোষের মধ্যে (Intracellular) বিস্তারলাভ করে। যেমন– *Chlamydia psittaci (ক্ল্যামাইডিয়া সিটাসি)*।

রিকেটশিয়া (Rickettsia)

পূর্বে রিকেটশিয়াকে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যবর্তী বলে বিবেচনা করা হতো।

এরাও এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যারা কোষের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। এক সময় এদেরকে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যবর্তী বলে বিবেচনা করা হতো। তবে, বর্তমানে এগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। তথাপি এরা ব্যাকটেরিয়া থেকেও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন– *Rickettsia rickettsae (রিকেটশিয়া রিকেটশি), Coxiella burnetta (কক্সিয়েলা বারনেটি)* ইত্যাদি।

ভাইরাস (ঠরৎঁং)

ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত অতি অণুবীক্ষণিক বস্তু যা উপযুক্ত পোষকের দেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম।

ভাইরাস আমিষ ও নিউক্লিক অ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের অতি অণুবীক্ষণিক (Ultramicroscopic) বস্তু যা শুধু উপযুক্ত পোষকের (Proper Host) দেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এদের আয়তন মাত্র ০.০১–০.০৩ মাইক্রোমিটার। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ০.২ মাইক্রোমিটারের থেকে ছোট বস্তু দেখা যায় না। তাই ভাইরাস শণাক্তকরণের জন্য ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope) ব্যবহার করতে হয়। পাখির বিভিন্ন ভাইরাসের মধ্যে রাণীক্ষেত রোগ ভাইরাস, মারেক'স ডিজিজ ভাইরাস, ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাস, ডাক প্লেগ ভাইরাস ইত্যাদি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্যারামিক্সোভাইরাস পক্সভাইরাস

হারপেসভাইরাস অ্যাডেনোভাইরাস রিওভাইরাস

চিত্র ৪ ঃ বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস

প্রোটোজোয়া (Protozoa)

প্রোটোজোয়া এককোষি জীব হলেও এদেরকে পরজীবীর সঙ্গেই শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

এরা এককোষি জীব। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদেরকে দেখা না গেলেও সাধারণত অণুজীব হিসেবে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক প্রভৃতির সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাস না করে বরং এদেরকে পরজীবীর (Parasite) সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। পোল্ট্রির বিভিন্ন প্রোটোজোয়ার মধ্যে ককসিডিয়া, হিস্টোমোনাস, ট্রাইকোমোনাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

ককসিডিয়া হিস্টোমোনাস ট্রাইকোমোনাস

চিত্র ৫ ঃ পোল্ট্রির বিভিন্ন ধরনের প্রোটোজোয়া

রোগজীবাণুর বিস্তার

পোল্ট্রির রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগের উৎস ও বিস্তার জানা একান্ত জরুরি।

রোগজীবাণুর উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে সহজেই যে কোনো জীবাণুঘটিত, পরজীবীঘটিত বা অন্যান্য রোগ দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কাজেই পোল্ট্রি খামার ও গ্রাম বা অন্যান্য পোল্ট্রি পালন এলাকায় রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগের উৎস ও বিস্তার জানা একান্ত জরুরি। এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জীবাণু ও পরজীবী পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন– বাহক পাখি; ডিম; অন্যান্য পশুপাখি; ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকি; কীটপতঙ্গ; বাতাস; খাদ্য ও পানি; লিটার; বিভিন্ন যন্ত্রপাতি; খাদ্য ও পানির পাত্র; বিভিন্ন প্রজাতি ও বয়সের পাখি একত্রে পালন; সর্বোপরি মানুষের মাধ্যমে।

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলো পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করতে পারে। যেমন–

- **বাহক পাখির মাধ্যমে ঃ** রোগ থেকে সেরে ওঠা পাখি অনেক সময় বহুদিন পর্যন্ত সে রোগের জীবাণু বহন করে বেড়ায়। আবার অনেক পাখি স্বাভাবিকভাবেও রোগের জীবাণু বহন করতে পারে। এ ধরনের পাখি খাদ্য, পানি ও পরিবেশ দুষিত করে সুস্থ পাখিতে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া এসব বাহক পাখি এক খামার থেকে অন্য খামারে বা এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরের মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। বাহক পাখির মাধ্যমে সাধারণত পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, ককসিডিওসিস, হিস্টোমোনিয়াসিস ইত্যাদি রোগ ছড়াতে পারে।
- **ডিমের মাধ্যমে ঃ** কোনো কোনো রোগজীবাণু বাহক বা আক্রান্ত পাখির ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া এসব জীবাণু কলুষিত মাটি থেকেও ডিমের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। এসব জীবাণুযুক্ত ডিম বাচ্চা ফোটানোর কাজে ব্যবহার করলে ডিমের ভিতরেই বাচ্চার মৃত্যু ঘটে। আর যেসব বাচ্চা ডিম ফুটে বের হয় সেগুলোও বাঁচে না। ডিমের মাধ্যমে পুলোরাম, ফাউল টাইফয়েড, মাইকোপ্লাজমোসিস, মারেক'স প্রভৃতি রোগের জীবাণু বিস্তারলাভ করতে পারে।
- **অন্যান্য পশুপাখির মাধ্যমে ঃ** সঠিকভাবে মৃত পাখি সৎকার না করে যত্রতত্র ফেললে বিভিন্ন পশুপাখি, যেমন– কাক, চিল, শকুন, কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি এসব মৃত পাখি ভক্ষণ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে রোগজীবাণু ছড়ায়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত বা বাহক বন্য পশুপাখি খামার বা পোল্ট্রি পালন এলাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করলে বা প্রবেশ করলেও বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে।
- **ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকির মাধ্যমে ঃ** এসব প্রাণীর মাধ্যমে সহজেই খামারের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়াতে পারে। যেমন– *Salmonella (সালমোনেলা)* জীবাণু।

- **কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ঃ** বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, যেমন– মশা, মাছি, ফ্লি, আটালি ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ পাখিতে ছড়াতে পারে। যেমন– বসন্ত, মারেক'স, পাইরোপ-াজমোসিস, লিউকোসাইটোজোনিয়াসিস ইত্যাদি।
- **বাতাসে ভাসমান ধ লিকণার মাধ্যমে ঃ** এভাবে বহু রোগের জীবাণু পাখিতে ছড়াতে পারে। যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, মারেক'স ইত্যাদি।
- **খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ঃ** রোগজীবাণু দ্বারা খাদ্য ও পানি দুষিত হলে সে খাদ্য ও পানির মাধ্যমে পাখিতে রোগ ছড়াতে পারে। যেমন– *Salmonella* জীবাণু। আবার খাদ্য ছত্রাক দ্বারা দুষিত হলেও পাখি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন– অ্যাসপারজিলোসিস, মাইকোটক্সিকোসিস ইত্যাদি।
- **পোল্ট্রির লিটারের মাধ্যমে ঃ** রোগজীবাণু দ্বারা লিটার দুষিত হলে সে লিটারে পালিত পাখিও রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যেমন– রাণীক্ষেত, গামবোরো, ককসিডিওসিস ইত্যাদি রোগের জীবাণু লিটারের মাধ্যমে ছড়াতে পারে।
- **পোল্ট্রি খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও পানির পাত্রের মাধ্যমে ঃ** এসবের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়াতে পারে।
- **বিভিন্ন প্রজাতির পাখি একত্রে পালন করলে ঃ** বিভিন্ন প্রজাতির পাখি একত্রে পালন করা উচিত নয়। কারণ, এতে এক প্রজাতির পাখির রোগজীবাণু অন্য প্রজাতির পাখিকে আক্রান্ত করতে পারে। যেমন– মুরগির হিস্টোমোনিয়াসিস রোগ এভাবে টার্কিতে প্রবেশ করতে পারে।
- **বিভিন্ন বয়সের পাখি একত্রে পালনের মাধ্যমে ঃ** বিভিন্ন বয়সের পাখি একত্রে পালন করলে সহজেই বয়স্ক বাহক পাখি থেকে বাচ্চায় রোগজীবাণু ছড়ায়। যেমন– *Salmonella* ও *Eimeria* প্রজাতির জীবাণু বা পরজীবী সহজেই এভাবে বাচ্চা মুরগিতে ছড়ায়।
- **মানুষের মাধ্যমে ঃ** পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষও কম দায়ী নয়। খামারের শ্রমিক, কর্মচারী বা দর্শণার্থীর জামা, জুতো প্রভৃতির সাথে রোগজীবাণু লেগে থাকলে কাজ করার সময় বা পরিদর্শনকালে অসাবধানতাবশত এ রোগজীবাণুগুলো খামারের পোল্ট্রিতে ছড়াতে পারে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগজীবাণু বা রোগের নাম ও বিস্তারের মাধ্যম ছক আকারে লিখুন।*

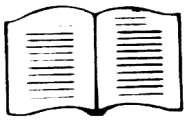

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রিকে আক্রান্ত কারী রোগজীবাণু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, মাইকোপ্লাজমা, রিকেটশিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি। এরা আকার, আকৃতি ও গঠনে একেক রকম হয়ে থাকে। এসব জীবাণুর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া অন্যতম। ব্যাকটেরিয়াকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। যেমন– গ্রাম স্টেইনে প্রতিক্রিয়া, অক্সিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বংশবিস্তার, আকার-আকৃতি প্রভৃতির ওপর। আকার-আকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়া গোলাকার, দন্ডাকৃতি, কমা, স্ক্রু বা হিটারের কয়েলের ন্যায় প্যাঁচানো প্রভৃতি ধরনের হতে পারে। আবার ছত্রাক হতে পারে এক বা বহুকোষি। প্রোটেজোয়া এককোষি এবং অণুবীক্ষণিক হলেও এদেরকে সাধারণত পরজীবী হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ও পরজীবী পোল্ট্রিতে বিভিন্নভাবে ছড়াতে পারে। যেমন– বাহক পাখি; ডিম; অন্যান্য পশুপাখি; ইঁদুর, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী ও টিকটিকি; কীটপতঙ্গ; বাতাস; খাদ্য ও পানি; লিটার; বিভিন্ন যন্ত্রপাতি; খাদ্য ও পানির পাত্র; বিভিন্ন প্রজাতি ও বয়সের পাখি একত্রে পালন; সর্বোপরি মানুষের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২

১। সঠিক উত্তরে পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. গোলাকৃতির ব্যাকটেরিয়াকে কী বলে?

i) কক্কাস
ii) ব্যাসিলাস
iii) ভিব্রিওস
iv) লেপ্টোস্পাইরা

খ. রিকেটশিয়াকে কার অধীনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়?

i) ভাইরাস
ii) প্রোটোজোয়া
iii) মাইকোপ্লজমা
iv) ব্যাকটেরিয়া

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. এককোষি ছত্রাকগুলোকে ঈস্ট বলে।
খ. ক্ল্যামাইডিয়া এক প্রজাতির ভাইরাস।

৩। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ভাইরাস _____ বস্তু যা শুধু উপযুক্ত পোষকের দেহে বংশবৃদ্ধি করে।
খ. পুলোরাম রোগের জীবাণু থথথথথ মাধ্যমে ছড়াতে পারে।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. যেসব ব্যাকটেরিয়া চেইন আকারে থাকে তাদেরকে কী বলে?
খ. কীটপতঙ্গের মাধ্যমে কোন্ কোন্ রোগ ছড়াতে পারে?

পাঠ ১.৩ পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনে করণীয়

এ পাঠ শেষে আপনি –

- পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জীব-নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠিগুলো উলে-খ করতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা আলোচনা করতে পারবেন।
- পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচী সফল করার উপায় লিখতে পারবেন।
- পোল্ট্রি খামারে মড়কের সময় করণীয় কাজ বলতে পারবেন।

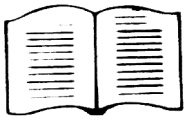

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ বা দমনই শ্রেয়।

পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনের প্রয়োজনীয়তা

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধ বা দমনই শ্রেয়। রোগব্যাধি হলে নিরাময়ের জন্য অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু যদি রোগ হওয়ার আগেই এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যাতে রোগই না হয়, অর্থাৎ যদি আগে থেকেই রোগ দমন করা যায়, তবে চিকিৎসার কোনো দরকারই পড়বে না। পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে দমন ও প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুর€ত্ব দেয়া হয়। কারণ, এ অধিক উৎপাদনশীল ছোট্র প্রাণীগুলোর রোগ সারানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করলে অনেকক্ষেত্রেই এরা রোগ থেকে সেরে ওঠে সত্য, কিন্তু রোগসংক্রান্ত পীড়নের ফলে এরপর এদের থেকে আর কা খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাছাড়া ভাইরাসঘটিত রোগের জন্য তো এখন পর্যন্ত কোনো চিকিৎসাই আবিষ্কৃত হয় নি। পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনে খামারী বা পোল্ট্রি পালনকারীর বেশ কিছু করণীয় কাজ আছে। এ কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারলেই পোল্ট্রি খামার রোগমুক্ত থাকবে। কাংখিত উৎপাদন পাওয়া যাবে এবং খামারী তথা দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।

পোল্ট্রির রোগব্যাধি দমনে করণীয়

খামারে রোগব্যাধি দমনের নিয়মকানুনগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যেক খামারীর একান্ত কর্তব্য।

পোল্ট্রি খামার তা ছোট হোক বা বড় হোক এবং মুরগি, হাঁস বা কোয়েল যে কোনো প্রজাতির জন্যই হোক না কেন খামারে রোগব্যাধি দমনের জন্য কতকগুলো নিয়ম রয়েছে। এগুলো কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যেক খামারীর একান্ত কর্তব্য। তবেই খামার হবে রোগমুক্ত। খামারে রোগব্যাধি দমনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তবে, এগুলোর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– খামারের ভৌগলিক অবস্থান, জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খামারের স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা, টিকাদান কর্মস চি ইত্যাদি।

জীব-নিরাপত্তা (Bio-security)

রোগ ও রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি রয়েছে তাদের সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে পোল্ট্রি শিল্পে 'জীব-নিরাপত্তা' বা Bio-security কথাটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে। রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রি রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি আছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রির জীবন রক্ষা করা বা নিরাপত্তাবিধান করা। তবে, যদিও 'জীব-নিরাপত্তা' কথাটি পোল্ট্রি উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে তথাপি এ সম্পর্কে অনেক খামারির মধ্যেই বিভ্রান্তির অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন হয়তো পোল্ট্রি হাউজের প্রবেশপথ জীবাণুনাশক দিয়ে বা এজাতীয় কিছু টুকটাক ব্যবস্থার মাধ্যমেই পোল্ট্রির 'জীব-নিরাপত্তা' বিধান করা যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ঠিক নয়। আসলে জীব-নিরাপত্তা হচ্ছে সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে।

রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠি

নিম্নে আলোচিত বিষয়গুলোকে পোল্ট্রির রোগপ্রতিরোধের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন–

- পরিŽছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং অন্য কোনো পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার থেকে যতটা সম্ভব দূরে খামার স্থাপন।
- আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন– আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা। লক্ষণীয় বিষয় হলো এ খাদ্য ও পানি যেন পোল্ট্রির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধিতে বাধাদানকারী উৎপাদকমুক্ত থাকে।

খামারে কার্যকর নিরোধন ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- কার্যকর নিরোধন (Quarantine) ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া খামারের প্রবেশপথে চেক পয়েন্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে করে খামারে কোনো জীবজন্তু বা মানুষের প্রবেশ ও বের হয়ে যাওয়ার ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
- খামারের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে পরিবেশ উপযোগী ঘর তৈরি করতে হবে।
- ইঁদুর ও অন্যান্য ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামারকে মুক্ত রাখতে হবে।

খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' পদ্ধতি মেনে চলতে

- খামারে 'সব-ভিতরে-সব-বাইরে' (all-in-all-out) পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ খামারের কোনো ঘরে একটি ব্যাচ ঢোকানোর পরে তা বিক্রি না করা পর্যন্ত সে ঘরে আর কোনো নতুন ব্যাচ ঢোকানো যাবে না। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এটি সম্ভব না হলে যত কম রাখা যায় ততই ভালো।
- কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ঐ এলাকায় প্রাপ্ত জীবাণুর সেরোটাইপের (Serotype) ওপর নির্ভর করে করতে হবে।
- মৃত পাখি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন– খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, টিকা বা ওষুধের খালি শিশি ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে।

খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।

- খামারে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে। যেমন– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৌতকরণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, ফিউমিগেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে পোল্ট্রি হাউজের ভিতর ও বাইরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারি ও কর্তাব্যক্তিকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।
- খামারে পেশাগতভাবে যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। যে কোনো প্রকার হাতুড়ে লোক খামারের লোকসানের জন্য যথেষ্ট।
- 'জীব-নিরাপত্তা' সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

যে কোনো জীব-নিরাপত্তা কর্মসূচির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর।

এ বারটি উপাদানের সবকয়টি একই সঙ্গে সঠিকভাবে যদি মেনে চলা না যায় তবে যে কোনো পোল্ট্রি খামারীর মহৎ উদ্যোগই ভেস্তে যাবে। যে কোনো 'জীব-নিরাপত্তা' কর্মস চির সার্থকতা নির্ভর করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও সময়ের মধ্যে সেটা সমাধা করার ওপর। আর তা করতে হলে খামারের সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তাছাড়া এ সম্পর্কে সকলের পর্যাপ্ত জ্ঞানও থাকতে হবে। কোনো জীব-নিরাপত্তা কার্যক্রমে, যেমন– হ্যাচারি বা ব্রুডিং এর জন্য এক ধরনের মানদন্ড আর গ্রোয়িং হাউস বা লেয়িং হাউজের জন্য অন্য এক ধরনের মানদন্ড থাকলে চলবে না। সবক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট মানদন্ড থাকতে হবে।

জীব-নিরাপত্তা বিষয়টি যেহেতু পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনা ও এর সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একত্রে নির্দেশ করে সেহেতু মানুষ জীব-নিরাপত্তা কার্যক্রমের একটি প্রধান অংশ। যেহেতু পোল্ট্রি পালনের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তির সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হওয়ার ওপর জীবাণুঘটিত রোগ হওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে সেহেতু পোল্ট্রি খামারের আশেপাশে যারা অবস্থান করবে তাদের সকলকেই সমানভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানো রোধের উপায়

মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

- অপ্রয়োজনে যে কোনো দর্শনার্থীকে খামারের ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া।
- যেসব দর্শনার্থী অনুমতি সাপেক্ষে খামারে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেকের রেকর্ড রাখতে হবে। যেমন– তাদের পেশা কী, কেন এবং কখন তারা খামারে প্রবেশ করেছিল, তারা ঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়েছিল কি–না ইত্যাদি।

এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার দ্বারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে।

- এমন একটি প্রবেশ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করতে হবে যার দ্বারা ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকা সঠিকভাবে পার্থক্য করা যাবে। অর্থাৎ ময়লা এবং পরিষ্কার এলাকার মধ্যে ডিভাইডার (Divider) থাকবে যাতে যে কেউ বুঝতে পারে পরিষ্কার এলাকায় যেতে হলে নিজেকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- যে কোনো বড় খামারের ক্ষেত্রেই গাড়ি পার্কিংয়ের এলাকা, দর্শনণার্থী কক্ষ ইত্যাদিকে ময়লা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। গাড়ির ড্রাইভার এবং গাড়ি দুটোই ময়লা হিসেবে বিবেচিত হবে। কাজেই পোল্ট্রিসামগ্রী বহনকারী গাড়ি, ড্রাইভার এবং পোল্ট্রিম্যানকে পরিষ্কার এলাকাতে ঢুকতে হলে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হতে হবে।
- দর্শনার্থীর মধ্যে যারা পোল্ট্রি খামারের পরিষ্কার এলাকায় প্রবেশ করবে তাদেরকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে। আর পোল্ট্রি হাউজে যেসব পোল্ট্রিম্যান কাজ করতে ঢুকবে তারা অবশ্যই রাবারের জুতো, বিশেষ ধরনের জামা ও মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি পরে ঢুকবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি হাউজের দরজার সামনে জীবাণুনাশক ওষুধ থাকবে যা তাদেরকে মাড়িয়ে যেতে হবে।

খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

ছোটখাট খামারে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু প্রবেশ করতে পারে। যেমন– খাদ্য ও পানির পাত্র, ডিম সংগ্রহের যন্ত্র, পোল্ট্রি বর্জ্য সংগ্রহের যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রোগ ছড়ানোর মাধ্যম হওয়ার কারণে এগুলোকে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করে ভিতরে ঢোকাতে হবে। আর এগুলোর নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। তাছাড়া খামারের এক ঘরের যন্ত্রপাতি অন্য ঘরে নেয়ার মাধ্যমেও রোগজীবাণু ছড়াতে পারে। সেকারণেই সম্ভব হলে প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত।

খামারের নিজস্ব পোল্ট্রি বাদে আশেপাশের এলাকার যে কোনো পোল্ট্রি, পোষা পাখি বা প্রাণী এবং বন্যজন্তু রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। কাজেই এগুলোকে খামারের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। খামারে অবস্থানরত অনেক কর্মচারিই ব্যক্তিগতভাবে মুরগি বা অন্যান্য পশুপাখি পুষে থাকেন। এগুলো অবশ্যই রোধ করতে হবে। আর এটি করার উৎকৃষ্ট পথ হলো তাদেরকে সস্তায় ডিম ও মাংস সরবরাহ করা।

খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

বন্যজন্তু এবং ইঁদুর যেহেতু পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাই ঘরের দরজা, জানালা, ভেন্টিলেটর ইত্যাদিতে চিকন তারজালির স্ক্রীন লাগিয়ে হাউসে এদের প্রবেশ রোধ করা যায়। তবে, খাদ্য এবং লিটার গুদাম এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা বেশ কষ্টকর। খামারে ইঁদুরের উপদ্রব কমাতে হলে খাদ্যগুদাম সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাছাড়া পোল্ট্রি ঘরে ব্যবহৃত খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যেখানে সেখানে খাদ্যের উচ্ছিস্টাংশ ফেললে বা পোল্ট্রি খামারের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার না রাখলে সহজেই ইঁদুর সেখানে বাসা তৈরি করবে, বাচ্চা দেবে, উৎপাত করবে এবং রোগজীবাণু ছড়াবে। কাজেই পুড়িয়ে বা অন্য কোনো উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ পদ্ধতিতে সৎকার করতে হবে। তাছাড়া কম্পোস্ট বা পিট পদ্ধতির মাধ্যমেও এগুলো থেকে উৎকৃষ্টমানের সার তৈরি করা যায়।

স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত।

সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। খামারে স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা রক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্য পালনীয়–

- পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি এবং আশেপাশে অন্য কোনো পোল্ট্রি বা পশুপাখির খামার না থাকলেই ভালো।

- আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন– আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- খামারে বিভিন্ন প্রজাতির পোল্ট্রি পালন না করা।
- বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করা।

বিভিন্ন বয়সের পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান বংশ এবং বিশুদ্ধ খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

- রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহীন পাখি সুস্থ পাখিদের থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথক করে ফেলা।
- ডিম ফোটানোর পূর্বে সঠিকভাবে ফিউমিগেশনের মাধ্যমে তা জীবাণুমুক্ত করা।
- খামার থেকে কোনো একটি ব্যাচ বিক্রি করার পর বা ঘর থেকে স্থানান্তর করার পর সেখানে আরেকটি ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে অবশ্যই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এরপর পরবর্তী ব্যাচ প্রবেশ করানোর পূর্বে ঘর কিছুদিন খালি অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত। তাছাড়া খামারের অন্যান্য জিনিসপত্র, সরঞ্জামও জীবাণুমুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি খামারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকেও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হয়ে থাকতে হবে।

খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না।

- ইঁদুর ও ইঁদুরজাতীয় প্রাণী বা রডেন্ট (Rodents), কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামার মুক্ত রাখতে হবে। এসব প্রাণী খাদ্য নষ্ট করা, খাদ্যে রোগজীবাণুর দূষণ ঘটানো ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে। সে কারণে খামারে ইঁদুরের উপস্থিতি জেনে নিয়ে এদের দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ করতে ঘরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পলেস্তরা (Plaster) করতে হবে। তাছাড়া ঘর এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কোনো ফাঁকফোকড় না থাকে। খাদ্য বা ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলে রাখা চলবে না। খামার বা শেডে (Shed) সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকলে বিভিন্ন ধরনের পাখি সহজেই প্রবেশ করবে। তাই ভেন্টিলেটর, জানালা বা অন্যান্য খোলা জায়গায় চিকন তারজালির স্ক্রিন লাগিয়ে খামারে এদের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- খামারে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যাকে তাকে খামারে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। যদি কারও প্রবেশের প্রয়োজন হয় তবে অবশ্যই সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করতে হবে। কোনো দর্শনার্থীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে তাকে প্রবেশ করতে দেয়া উচিত নয়।

মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

- মুরগির ক্ষেত্রে কার্যকর টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। টিকাদান কর্মসূচি অবশ্যই খামার ও তার আশেপাশের এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাবের ওপর নির্ভর করে করতে হবে। তাছাড়া সময়মতো কৃমির ওষুধও খাওয়াতে হবে। তবে কোয়েলের ক্ষেত্রে এসবের কোনো দরকার নেই।
- মৃতপাখি ও পোল্ট্রি বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও খামারের অন্যান্য বর্জ্য, যেমন– খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, ওষুধ বা টিকার খালি শিশি (Vial) ইত্যাদি গর্ত করে মাটিচাপা দিতে হবে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায়

রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খামারে রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। এখানে টিকাদান কর্মসূচি সফল করার উপায় আলোচনা করা হয়েছে। যেমন–

- টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়, ক্রম ও মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

কোনোক্রমেই সময়োত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।

- কোনোক্রমেই সময়োত্তীর্ণ টিকা ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা সঠিক নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত তাপমাত্রায় বরফসহ ফ্লাক্সে পরিবহণ করাই ভালো।
- সরাসরি সূর্যালোকে মিশ্রণ করলে টিকাবীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই সব সময় ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে টিকা মিশ্রণ করতে হবে।
- ৩০°সে. এর অধিক তাপমাত্রায় টিকা প্রদান করা হলে তা সঠিকভাবে কাজ করবে না, তাই দিনের অপেক্ষাকৃত শীতল সময়ে অর্থাৎ সকাল ও বিকেলে টিকা প্রদান করা উচিত।
- অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত পাখিকে টিকা দেয়া যাবে না।

টিকা গুলতে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভালো।

- মুখের সাহায্যে পানির মাধ্যমে ব্যবহার্য টিকা পানির ভিতর গুলতে হবে।
- ট্যাপের পানিতে জীবাণুনাশক ক্লোরিন থাকায় টিকা গুলতে এ পানি ব্যবহার করা যাবে না। এ কাজে পরিস্রুত পানি ব্যবহার করাই ভালো।
- টিকা গুলতে ধাতব পাত্র ব্যবহার না করে প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা ভালো।
- অনেক ওষুধ আছে যেগুলো ব্যবহার করার সময় টিকা দিলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। যেমন– হাইড্রোকর্টিসোন, টেস্টোসটেরন, প্রেডনিসোলন ইত্যাদি। তাছাড়া ব্যাকটেরিয়াল টিকার ক্ষেত্রে টিকা দেয়ার তিনদিন পূর্ব থেকে তিনদিন পর পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে।

টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

- টিকা ব্যবহারে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন না করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবিত টিকা থেকে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া বা বেঁচে যাওয়া টিকা এবং টিকার খালি বোতল শক্তিশালী জীবাণুনাশক দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে হবে।
- মুখের সাহায্যে ব্যবহার্য টিকা পান করানোর ২–৩ ঘন্টা পূর্বে পানি পান করানো বন্ধ রাখতে হবে যেন মিশ্রিত টিকা সামনে দেয়ার পর দ্রুত এরা এগুলো পান করে। অবশ্যই মিশ্রণের দু'ঘন্টার মধ্যে সমস্ত টিকা পান করাতে হবে।

টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে।

- খাবার পানির সঙ্গে মিশিয়ে টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ মুরগির বয়স, আবহাওয়া এবং লেয়ার বা ব্রয়লার অর্থাৎ মুরগির টাইপের ওপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে।
- টিকাদানের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রোগজীবাণুমুক্ত হতে হবে।

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়কে করণীয়

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ পাখি থেকে রোগাক্রান্ত পাখি পৃথক করে ফেলতে হবে।

পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

- সুস্থ পাখি থেকে সত্বর রোগাক্রান্ত পাখি পৃথক করে ফেলতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পাখির চিকিৎসা ও সুস্থ পাখিকে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- খামারে দর্শণার্থীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।
- চিকিৎসাতেও যেসব পাখি আরোগ্য লাভ করবে না বা রোগ থেকে সেরে ওঠার পরে বাহক পাখিতে পরিণত হবে সেগুলোকে মেরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- রোগজীবাণুর উৎস খুঁজে বের করে তা নির্মল করতে হবে।
- মৃত পাখি ও পোল্ট্রি বর্জ্য যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পাখির ঘর, খাঁচা, খাদ্য ও পানির পাত্র এবং অন্যান্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম উপযুক্ত জীবাণুনাশক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে।
- সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য নিকটস্থ ভেটেরিনারি সার্জন বা পশু চিকিৎসকের পরামর্শমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলন (Activity) ঃ *আপনার মতে খামারে কীভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের সৃষ্টি করা যায়? যুক্তিসহ লিখুন।*

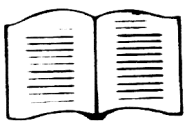

সারমর্ম ঃ পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে দমন ও প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। খামারে রোগব্যাধি দমনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন– খামারের ভৌগলিক অবস্থান, জীব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থাপনা, মানুষের মাধ্যমে রোগজীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা, টিকাদান কর্মসূচি ইত্যাদি। রোগ এবং রোগজীবাণুর হাত থেকে পোল্ট্রিকে রক্ষা করার জন্য যত ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি রয়েছে তাদের সবগুলোর সমন্বয়কে একত্রে 'জীব-নিরাপত্তা' বলে। এটি সফল পোল্ট্রি উৎপাদনের জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিব্যবস্থা যার সাহায্যে পোল্ট্রিকে বিভিন্ন রোগজীবাণুর কবল থেকে রক্ষা করা যাবে। মানুষের মাধ্যমে যাতে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সঠিক স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন ব্যবস্থা পোল্ট্রি

খামারের সাফল্যের অন্যতম পূর্বশর্ত। রোগপ্রতিরোধে টিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খামারে রোগপ্রতিরোধের জন্য টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। পোল্ট্রি খামারে রোগের মড়ক দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে সুস্থ পাখি থেকে রোগাক্রান্ত পাখি পৃথক করে ফেলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. পোল্ট্রি খামাারে রোগজীবাণু ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম কে?

i) মানুষ
ii) বন্যপ্রাণী
iii) খামারের যন্ত্রপাতি
iv) ইঁদুর

খ. কত তাপমাত্রার উপর টিকা দিলে তা সঠিকভাবে কাজ করবে না?

i) ১০° সে .
ii) ১৫° সে.
iii) ২২° সে.
iv) ৩০° সে.

২। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. খামারে দর্শনার্থীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।
খ. টিকার সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার করা যায়।

৩। শূণ্যস্থান পূরণ কনুন।

ক. খামারে পর্যাপ্ত _____ পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে।
খ. _____ সম্পর্কে সঠিক ও পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

৪। এক কথা বা বাক্যে উত্তর দিন।

ক. পোল্ট্রি হাউজে কীভাবে বন্যজন্তু ও ইঁদুরের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
খ. মুরগির রোগপ্রতিরোধে খামারে কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ১

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগব্যাধির নাম লিখুন।
২। পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করুন।
৩। বাংলাদেশে পোল্ট্রি উৎপাদনে কোন্ রোগটি প্রধান অন্তরায়? পোল্ট্রিতে রোগব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ লিখুন।
৪। অণুজীব ও রোগজীবাণু কী? উদাহরণসহ লিখুন।
৫। কী কী বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়? সংক্ষেপে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
৬। ছত্রাক, মাইকোপ্লাজমা ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন।
৭। উদাহরণসহ বাহক পাখি ও ডিমের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণুর বিস্তার আলোচনা করুন।
৮। জীব-নিরাপত্তা কী? কীভাবে পোল্ট্রি খামারে জীব-নিরাপত্তা বিধান করা যায়?
৯। কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মানুষের মাধ্যমে পোল্ট্রিতে রোগজীবাণু ছড়াবে না?
১০। কীভাবে পোল্ট্রির টিকাদান কর্মসূচী সফল করা যায়?

উত্তরমালা – ইউনিট ১

পাঠ ১.১

১। ক. iv ১। খ. iii ২। ক. স. ২। খ. স ৩। ক. মাইকোটক্সিকোসিস ৩। খ. নীতির ৪। ক. পরিবেশে রোগজীবাণু ছড়ায় ৪। খ. রাণীক্ষেত, গামবোরো ও ডাক প্লেগ

পাঠ ১.২

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. অতি অণুবীক্ষণিক ৩। খ. ডিমের ৪। ক. *Streptococcus* ৪। খ. বসন্ত, মারেক'স, মাইকোপ্লাজমোলোসিস, লিউকোসাইটোজোনিয়াসিস ইত্যাদি

পাঠ ১.৩

১। ক. i ১। খ. iv ২। ক. স ২। ক. মি ৩। ক. স্বাস্থ্যপ্রদ ৩। খ. জীব-নিরাপত্তা ৪। ক. হাউজের দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেটরে চিকন তারজালির স্ক্রীন লাগিয়ে ৪। খ. টিকাদান কর্মসূচি